নির্বাচিত গল্প

শেখর বসু

লিইবার ফিয়েরো

কিছু কথা

আমার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত আটটি। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দশটি গল্প', প্রকাশকাল ১৯৬৯। বাকি সাতটি গল্পের বই হল 'মাঝখান থেকে' (১৯৮০), 'পরম্পরা' (১৯৮৯), 'মায়ানগরের রাত' (১৯৯২), 'ভালোবাসা' (১৯৯৪), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৯৮), 'পঞ্চাশটি গল্প' (২০১০), 'প্রিয় গল্প' (২০১৮)। প্রথম দিকের কয়েকটি গল্প-সংকলন একাধিক সংস্করণের পর এখন নিঃশেষিত। তবে ওই সব গল্পের অনেকগুলি ধারা আছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'পঞ্চাশটি গল্প'-শীর্ষক গল্পগ্রন্থে। পঁচিশটি নতুন ও পুরনো অগ্রন্থিক গল্প স্থান পেয়েছে 'প্রিয় গল্প'-তে।

আমার গ্রন্থবদ্ধ মোট গল্পের সংখ্যা প্রায় দেড়শো। এগুলির বাইরেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা আরও প্রায় শতখানেক গল্প আছে। বেশি গল্পই প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার, দেশ, আজকাল, প্রতিদিন, বর্তমান, সাপ্তাহিক বর্তমান, সানন্দা ইত্যাদি পত্রিকার সাধারণ ও পুজোসংখ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ ছোট পত্রিকাগুলিতেও বেশ কিছু গল্প ছাপা হয়েছে।

শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছোটগল্পই আমার প্রথম ভালোবাসা। গল্প-আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। 'লাইবার ফিয়েরি' (এলএফ) প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রী অরুণাংশু বিশ্বাস আমার 'নির্বাচিত গল্প' কয়েক খণ্ডে প্রকাশকের পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই উদ্যোগের প্রথম বই 'নির্বাচিত গল্প-১'-এ সংকলিত বেশির গল্পই আট ও নয়ের দশকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, কয়েকটি অবশ্য সাম্প্রতিক কালের। দীর্ঘ কালসীমার মধ্যে রচিত গল্পগুলিতে পর্বান্তর স্বাভাবিক, তবে একজন লেখক তাঁর মূল স্বভাবধর্মের বাইরে যান না। গল্পগুলি রসজ্ঞ পাঠকের ভালো লাগলে বাধিত হব।

সল্ট, লেক, কলকাতা ১০৬ **শেখর বসু**

সূ চি

বাঙালির কাটাছেঁড়া ১১
নিয়মের বাইরে ২০
ভয়ংকর আমের চারা ২৮
ওদের সঙ্গে ৩৬
তনিমা রেগে গিয়েছিল ৪৩
সিনেমার পরে ৪৯
গাড়ির দুঃখে ৬০
ভূতের ভয় নেই ৬৭
সবাই মিথ্যে বলে ৭৯
দুর্ঘটনার পরে ৮৯
বিচার ৯৮
নিজের বিপদে বুদ্ধিমানরাও ১০৬
এক যাত্রায় ১২৩
মৎস্যকন্যা ১৩৪
ঠিক আগের মতোই ১৫০
উলটো দিকে ১৫৯
সুস্বাস্থ্যের রহস্য ১৬৮
দশটা হাত ১৮২
আমাদের কোনও শাখা নেই ১৮৮
হাতের রেখায় ১৯৭
গরমিল দেখার পরে ২০৪
গল্পের গাছ ২১১

বাঙালির কাটাছেঁড়া

দশ দিনের সুন্দর একটা সফর শেষ। সফরসূচির অদলবদল হয়নি কোথাও, হোটেলগুলো সবারই বেশ পছন্দসই ছিল। ছ'জনের দল। একটা বড় গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। ড্রাইভার বেশ হাসিখুশি, জোরে চালায় কিন্তু র‍্যাশ ড্রাইভিংয়ের দিকে যায়নি কখনও। তাছাড়া রাস্তাঘাটও ভালো ভাবে চেনার দরুন দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোর বেশির ভাগই দেখা হয়ে গিয়েছিল চটপট। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। এবার ঘরে ফেরার পালা। মুম্বইয়ের ভিটি থেকে হাওড়া দুটো রাত একটা দিনের লম্বা জার্নি। এক্সপ্রেস ট্রেনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই বগিটাও বেশ ঝকঝকে-তকতকে। একটা কুপে এই ছজনের দখলে। ওপাশের সাইডবার্থে মাঝবয়সী এক অবাঙালি দম্পতি। সফর শেষে ট্রেনে প্রথম রাত এই ছয় যাত্রীর কেটে গিয়েছিল গভীর ঘুমে। ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে, কিন্তু কামরার মধ্যে বিশেষ দুলুনি নেই। একটু আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়েছে সবাই। এখন প্রত্যেকের হাতেই কফির কাপ। কাচে মোড়া জানলা দিয়ে সকালের মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছিল কুপের মধ্যে। বেড়ানোর জায়গাগুলো নিয়ে কয়েক দফা আলোচনা হওয়ার পরে গল্প ঘুরে গিয়েছিল পরনিন্দার দিকে। কেশে গলা পরিষ্কার করে সমরেন্দ্র বললেন, 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এটা তো একটা ঘটনা। সত্যি-মিথ্যে আমি অবশ্য যাচাই করতে যাইনি, তবে যাঁর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি আজেবাজে কথা বলার মানুষ নন—।'

গল্পের টানে একটু নড়েচড়ে বসেছিল এই কুপের বাকি পাঁচজন যাত্রী। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে আবার মুখ খুললেন সমরেন্দ্র। 'এই এক্সপ্রেস ট্রেনের কেটারিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন একজন বাঙালি। শুনেছি, গোড়ার দিকে লোকটার সার্ভিস খুব ভালো ছিল। যাত্রীদের ভালো খাবারদাবার দিত, খাবারের পরিমাণও ছিল যথেষ্ট। মুম্বই থেকে হাওড়া লম্বা জার্নি, তার মানে লোকটার ব্যবসার মাপও বেশ বড় ছিল। বড় ব্যবসা মানেই বড় লাভ। কিন্তু বাঙালি ব্যবসায়ী তো, রাতারাতি দ্বিগুণ লাভ না করলে চলবে

কেন? ব্যস, শুরু হয়ে গেল কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ। খাবারের মান বাজে হল। সার্ভিসের লোকজনও কমিয়ে দিয়েছিল। শুনেছি ওই বাঙালি মালিক শেষের দিকে নিজেও আর ব্যবসা দেখত না। রাতারাতি বেশি লাভের ধান্দা, তার ওপর লোক রেখে কারবার চালানোর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছিল। অত বড় ব্যবসাটা অল্প কিছুদিনের মধ্যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল ওই বাঙালি ব্যবসায়ীর।'

এবার কথার খেই ধরলেন বিজিত মৈত্র। বললেন, 'আমি বাইপাসের ধারে ছোটখাটো একটা বাড়ি বানিয়ে বছর-কুড়ি ধরে আছি, যখন ওখানে প্রথম গিয়েছিলাম তখন চারপাশে ধু-ধু মাঠ, জলাজঙ্গল। সত্যি কথা বলতে কি, রাত্তিরে মাঝেমধ্যে একটু ভয়ই করত আমাদের। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকটা বাড়ি উঠে গেল চারপাশে। এখন তো এলাকাটা রীতিমত ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে। কোথাও এক ছটাক জমি পড়ে নেই। বড় রাস্তার পাশে হাইরাইজ। ওখানে এখন ফ্ল্যাটের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। চোখের সামনে আস্ত একটা বসতি গজিয়ে উঠতে দেখলাম। প্রথম দিকে ওখানে শুধু বাঙালিরাই ছিল। পরে দু-চারজন করে অবাঙালিও ঢুকতে থাকে, এখন ওদের সংখ্যাটা বেশ বেড়ে গিয়েছে। বাঙালির সংখ্যাও বেড়েছে। আর বাঙালির সংখ্যা বাড়লে কী বাড়ে বলো তো?'

'কী?'

আগ্রহী শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে রহস্যময় একটা হাসি হাসলেন বিজিত, তারপর বললেন, 'ক্লাব। কেলাবও বলতে পারো। দলের সংখ্যা একটু বাড়লেই ক্লাব তৈরি করে বাঙালিরা। কী হয় সেখানে? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ-গান-আবৃত্তি; থিয়েটার-টিয়েটারও হয়। ক্লাব চালায় পাড়ার শিক্ষিত বাঙালি বেকাররা। শিক্ষিত মানে কোনওমতে সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি ডিঙোনো। দু-চারটে পৌঁছেছে বি এ-র দোরগোড়া পর্যন্ত, ব্যস ওই পর্যন্তই। ওই বিদ্যেয় চাকরি জোটে না। ওদের সঙ্গে একেবারে গোড়ার দিকে আমি বন্ধুর মতো মিশতাম। বলতাম, ক্লাবঘরে বসে শুধু ক্যারম পেটালে আর গুলতানি মারলে একেবারে অকম্মা হয়ে যাবে। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ তখন মিনমিন করে বলত, চাকরির জন্যে এদিক-ওদিক বিস্তর অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েছি, কিন্তু একটারও তো জবাব আসে না। কারা চাকরি পায় কে জানে! শুনে ক্ষেপে গিয়ে বলতাম—তোমাদের বিদ্যের বহর তো জানি, আলাদা কোনো যোগ্যতাও নেই। কেন আসবে তোমাদের ইন্টারভিউয়ের চিঠি?'

নিয়মের বাইরে

শনিবার বিকেলে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল অলক। বসন্তের হাওয়া ছেড়েছে। দিনের চমৎকার শেষ আলোটুকু ছড়িয়ে আছে আকাশে। অলকের হঠাৎ মনে হল—আড্ডাবাজ পুরনো কোনও বন্ধু এই সময় এসে হাজির হলে বেশ হয়! আর ভাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলন এসে হাজির। এসেই বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নে, বেরুব।'

মিলন একশো ভাগ আড্ডাবাজ, আড্ডা এবং বড় ব্যবসা—দুটোই একসঙ্গে সামলানো খুব কঠিন, কিন্তু মিলন সেটা পারে। এক মিনিট নয়, অলকের তৈরি হতে পাঁচ-সাত মিনিট লেগে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসে মিলনের নতুন গাড়িতে চাপল। মিলন নিজেই গাড়ি চালায়। গাড়ি চলতে শুরু করার পরে অলক হাসতে হাসতে বলল, 'আজ কদিন ধরে দেখছি, আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে। যা ভাবি, যা বলি, সব ফলে যায়। এক্ষুনি মনে হচ্ছিল—তোর মতো কেউ আড্ডা মারতে আসবে।'

মিলন হাসতে হাসতে বলল, 'তাই! আচ্ছা, বল তো এখন কোথায় যাচ্ছি?'

অলকও হাসল। 'আরে! এটা সব সময় হয় না, হঠাৎ হঠাৎ হয়। চললি কোথায় এখন?'

মিলন এই প্রশ্নটার উত্তর দিল না, তার বদলে হাজার রকম গল্প জুড়ে দিয়েছিল।

মিনিট-কুড়ি সোজা রাস্তায় গাড়ি ছোটানোর পরে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল মিলন। ঘিঞ্জি বস্তি, সরু প্যাঁচানো রাস্তা। একটা পানের দোকানের পাশে একটুখানি বাড়তি জায়গা ছিল, সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মিলন বলল, 'আয় নেমে আয়।'

সামান্য আগে পরে দুজনেই নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। ডান দিকে খোলা নর্দমা, বাঁ দিকের পথ ধরল ওরা। কিছুটা সোজা যাওয়ার পরে সামনের গলির দিকে পা বাড়িয়ে মিলন বলল, 'আয়।' গলির ঠিক মাঝখানে একটা তোলা উনুন বসানো। উনুন থেকে গলগল করে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া

উঠছিল আকাশে। ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ধোঁয়াটা হঠাৎ বেঁকে গিয়ে ওদের ঢেকে ফেলেছিল প্রায়। অসহিষ্ণু গলায় অলক বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস বল তো?'

'এই তো এসে গেলাম বলে।'

বলার পরেও মিনিট তিন-চারের পথ হাঁটতে হয়েছিল। তারপর একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিলন বলল, 'আয়।' একটু ইতস্তত করার পরে ওর পিছু-পিছু সেই বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল অলক। খুব নিচু বারান্দা। পাশাপাশি চার-পাঁচটা ঘুপচি ঘর। বারান্দার তারে শাড়ি, লুঙ্গি আর গামছা ঝুলছিল।

একদম শেষের ঘরটার সামনে জুতো খুলে রেখে মিলন আর একবার বলল, 'আয়।'

ঘরে ঢুকতেই বছর ষাট-পঁয়ষট্টির একটা লোক ঝলমল করে হেসে উঠে বলল, 'এসো।'

মিলন মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে পুরো এক মিনিট ধরে প্রণাম করল লোকটাকে। লোকটার পরনে লাল লুঙ্গি। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের একটা মালা। ছোট ঘরের তিন দেয়ালে ঠাকুর-দেবতার পট আর দেবদেবীর ক্যালেন্ডারে ভর্তি। ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে একটা তক্তপোশ আর সরু বেঞ্চি।

পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অলক। ভেবেছিল এক, হয়ে গেল আর এক। মিলন অত কায়দা না করে প্রথমেই তো বলতে পারত—এক গুরুর কাছে যাচ্ছি, যাবি?

অলকের বিরক্তির মাত্রা আস্তে আস্তে আরও কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। আশীর্বাদ শেষ হওয়ার পরে বন্ধুকে দেখিয়ে মিলন বিগলিত গলায় বলে উঠল, 'বাবা, একে তুমি আগে দেখোনি, এ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অলক।'

বাবা অলকের দিকে তাকাতেই ও দুটো হাত সামান্য ওপরে তুলে নমস্কার করল। প্রসন্ন মুখে বাবা বললেন, 'বোসো।'

মিলন মেঝেতে বসে পড়েছিল। বাবা নির্ঘাত পাশের আসনে বসবেন। অলকের মনে হয়েছিল ওর অন্য কোথাও বসা দরকার। সেই হিসেবে ও সরু ওই বেঞ্চিটাতেই বসেছিল।

বাবা আসনেই বসলেন। মিলন আড়চোখে বন্ধুকে একবার দেখে নিয়েছিল। চোখ দেখেই অলক বুঝে গিয়েছিল, ওর চটে যাওয়ার ব্যাপারটা মিলন

ভয়ংকর আমের চারা

দু-কাঠা জমির ওপর ছোট্ট একটা তিনতলা বাড়ি। তিনটে তলায় তিনটি ফ্ল্যাট। প্রোমোটারের তৈরি। নানা রকম খুঁতে ভর্তি। কিন্তু রং-চং করার পরে বাইরে থেকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে প্রশান্তবাবুর হাতে কিছু টাকা এসেছিল, সেই টাকায় তিনতলার ফ্ল্যাটটা কিনে নিয়েছিলেন উনি। তারপর ভাড়াটে বাড়ির পাট চুকিয়ে উঠে এসেছিলেন নতুন ফ্ল্যাটে। ওঁর সংসার বলতে এখন বুড়োবুড়ি এবং ছেলে আর বউ।

ছেলে আর ছেলের বই কল-সেন্টারে কাজ করে। দুজনেরই চাকরির সময়টা বেজায় লম্বা। রাতেও কাজ করতে হয়। বাড়িতে থাকার বেশির ভাগ সময়টুকু ঘুমিয়ে কাটায়। ছুটিছাটায় সিনেমা-থিয়েটার দেখে কিংবা এদিক-ওদিক বেড়ায়।

প্রশান্তবাবু সারাজীবন বিস্তর কষ্ট করেছেন, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা কখনও ওঁর পিছু ছাড়েনি। কিন্তু অবসর নেওয়ার পরে নতুন ফ্ল্যাটে এসে উনি কিছুটা সুখশান্তির মুখ দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই ভাবেই বাকি জীবনটা কেটে যাবে।

ভোরবেলায় উঠে বেড়ান, ধর্মগ্রন্থ পড়েন, সামান্য কিছু লোক-লৌকিকতাও করেন। কিন্তু বছরখানেক বাদে বিদঘুটে একটা সমস্যায় ভীষণ ভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন।

প্রশান্তবাবু দূরদর্শী মানুষ। যে-কোনও বিষয়কেই দূর ভবিষ্যতে নিয়ে গিয়ে দেখার ক্ষমতা আছে ওঁর। কোথাও সামান্য ধোঁয়া উঠতে দেখলেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা করে থাকেন। অবিবেচকরা মানুক আর নাই মানুক, উনি জানেন ওঁর হিসেবে কখনও কোনো ভুল হয় না।

সেদিন তিনতলার বারান্দা থেকে নীচের দিকে তাকাতেই উনি ভয়ংকর এক বিপদের আভাস পেয়েছিলেন। নাকের ওপর চশমা এঁটে অনেকক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন রীতিমতো। নীচের একটুকরো জমিতে হাতদুয়েক মাপের একটা আমগাছের চারা।

চারাগাছে লালচে-লালচে পাতা গজিয়েছে বেশ কয়েকটা।

প্রশান্তবাবু গাছপালা চেনেন। বুঝতে পারলেন চারাগাছটা ভালো জাতের কলমের গাছ। তার মানে এটা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে। গাছের পাতাগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এর মধ্যেই গাছটার শিকড় মাটিতে বেশ গেড়ে বসেছে। দূর ভবিষ্যতের ছবি উনি খুব ভালো ভাবে দেখতে পারেন বলেই ওঁর অস্থিরতার মাত্রা অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

একতলার ফ্ল্যাটটা কিনেছে মাঝারি মাপের এক সরকারি আমলা। লোকটা খুব একটা সুবিধের নয়, কিন্তু প্রশান্তবাবু সৌজন্যের সম্পর্ক রেখে চলেন।

দিনতিনেক ভালো ঘুম হল না প্রশান্তবাবুর। প্রতিদিনের রুটিন-কাজের মধ্যেও কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তুচ্ছ কারণে বউয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হল কয়েকবার। প্রশান্তবাবু বরাবরই একটু চাপা স্বভাবের মানুষ। সমস্যার কথা কাউকে বলে উত্যক্ত করতে চান না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের তো একটা চেষ্টা চালানো উচিত। চতুর্থ দিন সকালে উঠে উনি শুকনো মুখে কিছুক্ষণ বেড়াবার পরে ফিরে এসে একতলার অর্ণব চৌধুরীর ফ্ল্যাটের ডোরবেল টিপলেন। দরজা খুললেন মিসেস চৌধুরী। অপ্রত্যাশিত অতিথিকে দেখে উনি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আসুন-আসুন ভেতরে আসুন।'

প্রশান্তবাবুও হাসলেন। 'অসময়ে এসে পড়লাম, না?'

'না-না, অসময় হবে কেন? বসুন আপনি। চা খাবেন তো?'

'তা একটু খেতে পারি।'

মিসেস চৌধুরী দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে কর্তাকে পাঠিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

মিস্টার চৌধুরী কেঠো হাসি হেসে বললেন, 'বেড়িয়ে এলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর ভালো তো আপনার?'

'এখনও পর্যন্ত মোটামুটি ভালো।'

এই ফ্ল্যাটে এখন বোধহয় চায়ের ব্যবস্থাই হচ্ছিল, মিসেস চৌধুরী চটপট একটা ছোটো ট্রেতে তিন কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে ফিরে এলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, 'যাতায়াতের পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় ঠিকই, কিন্তু সে-ভাবে গল্পগুজব হয় না তো কখনোই। তাই ভাবলাম মিনিট দশ-পনেরোর জন্যে আপনাদের